Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 428 – 441
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় হেমলতা দেবীর রচনা : বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

প্রতিমা সাহা
গ্রন্থাগারিক, আচার্য গিরিশ চন্দ্র বসু কলেজ
ইমেইল : tulu.pratima@gmail.com
ও
ড. স্বপ্না ব্যানার্জি
ডিন ও প্রফেসর
লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : swapna.banerjee98@gmail.com

Keyword
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনীর মহিলা লেখক, হেমলতা দেবী, রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ, 'সুফীবাদ' সম্পর্কিত রচনা, সুফী সাহিত্য।

Abstract
এক সময়ে মেয়েদের স্বাধীন বক্তব্য পেশ ও সাহসিকতার সাথে নিজের বক্তব্য জানার জন্য পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। মেয়েদের জন্য প্রকাশিত, প্রথম মহিলা সম্পাদিত কাগজ 'বঙ্গমহিলা' (প্রকাশ কাল ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ), সম্ভবতঃ ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জীর ভগিনী মোক্ষদয়িনী মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৯২ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পত্রিকার প্রশংসাধন্য রচনা সূচিত হয়। ধীরে ধীরে মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের পরে তত্ত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তার জন্য ঘাটতি দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অনেকখানিই মিটিয়েছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর একবছর তত্ত্ববোধিনীতে শুধু ধর্ম ও তত্ত্বশাস্ত্র সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হলেও, তারপর থেকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, সামরিক বিষয়বস্তু, প্রায় উল্লেখযোগ্য সমস্ত বিষয়েরই রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। যারফলে আবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়। শুধুমাত্র পুরুষরাই নয়, বহু মহিলা লেখকের রচনা এই সংখ্যাগুলিতে স্থান পায়, যদিও পূর্বেই বহু মহিলা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য কলম ধরেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যেমন তৎকালীন সময়কালের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধসমূহের সমষ্টি, তেমনি বতর্মান কালে দাড়িয়ে তৎকালীন সময়ের সামাজিক দৃষ্টিকোণকে বোঝার অন্যতম রসদ। বলা যেতে পারে, বতর্মানকালে এটি একটি অন্যতম গবেষণার আকরগ্রন্থ, প্রমাণ্যদলিল।

Discussion

১৯১০ খ্রীঃ থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে কাব্য-কবিতার প্রকাশ দেখা যায়, আর তার মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা লেখকদের দ্বারা রচিত। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ শক অর্থাৎ বেশিরভাগটাই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাকালে হেমলতা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, তাহেরপুরের রাজকুমারী সুমতি দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বেশিরভাগ ধর্মীয়, বলা যেতে পারে, ঈশ্বরভাবনা বা আধ্যাত্মিক আশ্রয়ী। আবার কোনো কোনো কবিতায় স্বদেশ ভাবনাও দেখা যায়, যেমন --হেমলতা দেবীর 'জগতজননী', প্রিয়ম্বদা দেবীর 'বর্ত্তমান'। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতায় একদিকে ঈশ্বরসাধনা, অন্যদিকে বিশুদ্ধ ভাবনা সম্পন্ন সুচারুভাষা ব্যবহৃত রচনাও পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মহিলা কবির (হেমলতা দেবীর) কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। আসলে, এই পত্রিকার প্রথমদিকে কোনো কাব্য-কবিতা প্রকাশিত হতো না, এটি ছিল সম্পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা নির্ভর সাময়িকপত্র যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করতো। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের জ্যেষ্ট সংখ্যায় অবশ্য প্রথম দুই মহিলা লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, প্রসন্নময়ী দেবী ও লীলাদেবীর নববর্ষকে কেন্দ্র করে দু'টি প্রবন্ধ রচনা। বলাই বাহুল্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মতো ধর্মনির্ভর পত্রিকায় মহিলা লেখকদের লেখা প্রকাশে বেশ বিলম্বই হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম নারীকবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী হেমলতা দেবী এবং 'প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগ্নী সরোজকুমারী দেবী, তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ, এরা সকলেই সামাজিক ও ধর্মগতভাবে ব্রহ্ম এবং কোন না কোনভাবে জোঁড়াসাকো ঠাকুরবাড়ীর সাথে পারবারিক দিক দিয়ে বা আত্মীয়তার দিক দিয়ে অথবা ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়ে বা বন্ধুত্বের দিক দিয়ে যুক্ত। এই সব মহিলা কবিদের লেখা থেকে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর ভাবপ্রকাশ পেয়েছে। কোথাও হেমলতা দেবীর কবিতায় ধরা পড়েছে জীবনে কল্পনার উপস্থিতি, আবার কোথাও প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার প্রকৃতির রূপ। আবার, কন্যার অকাল প্রয়াণে মাতার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের আকুল হাহাকার (কন্যার পরলোক গমনে, হিরন্ময়ী চৌধুরানীর কলমে) কবিতা মাধ্যমে প্রকাশিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঠাকুরবাড়ির বহু মহিলার রচনা পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র পুরুষরাই নয়, বহু মহিলা লেখকের রচনা এই সংখ্যাগুলিতে স্থান পায়, যদিও পূর্বেই বহু মহিলা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য কলম ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব লেখা পাঠক সমাজে সমৃদ্ধ করেছে, তারা বেশিরভাগই পুরুষ লেখক হলেও মহিলা লেখকদের অবদানও নিতান্ত কম নয়। আবার, বঙ্গসাহিত্যে ঠাকুর পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যেরই অবদান রয়েছে। ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি মহিলা সদস্যেরাও গল্প রচনায় সমানভাবে সাবলীল, বিশেষকরে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে। নারীশিক্ষায় মিশনারীদের অবদান এবং তৎকালীন কতিপয় বাঙালীর পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য হলেও, মহিলা লেখক হিসেবে কাউকে পাওয়া যায় না। বলাইবাহুল্য, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মহিলা রচিত কোন সাহিত্যসৃষ্টির সন্ধান মেলা দুস্কর। তবে ১৮৪৯ সালের যে সংখ্যায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এক জনৈক বালিকার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, আপাতত ধরে নেওয়া হয়, এটি প্রথম মহিলা লেখক দ্বারা রচিত সাহিত্যসৃষ্টি।

সাল	**গ্রন্থ**	**পত্রিকা**	**রচনা**
১৮০০-১৮৫৯	৪	৪	২০টি
১৮৫৯-১৮৭৯	১৯	৭	১২৩টি
১৮০০-১৮৮৯	৮৯	৩১	৫২১টি
(বলা প্রয়োজন, ৮৯টি গ্রন্থের মধ্যে ৪টি ছোটগল্প গ্রন্থ।			
১৮৯০-১৯০০	১২৩	৮৭	১৮৫৬টি
	(২টি গল্পগ্রন্থ)	(১০০টি গল্প)	

দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে লেখা পত্র-পত্রিকায় তার প্রকাশ। সেগুলি মূলত উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, জীবনী ইত্যাদি। তৎকালীন সময়ে গল্প বলতে কাহিনি বা আখ্যানকেই বোঝাতো, আধুনিক মৌলিক ছোটগল্প, লিরিকের জন্ম তখনো হয়নি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় হেমলতা দেবীর রচনা :

রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী হেমলতা দেবী একধারে ছিলেন কবি, অন্যদিকে ছিলেন 'সুফীবাদ' সম্পর্কিত রচনার স্রষ্টা। হেমলতা দেবী সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর সাহিত্য প্রতিভা দেখে শ্বশুরালয়েও সাহিত্য চর্চার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। দ্বিপেন্দ্রের প্রথম স্ত্রী সুশীলাদেবীর মৃত্যুর পর ১৬ বছর বয়সে ঠাকুরবাড়ির বৌ হয়ে আসেন হেমলতা দেবী। নিঃসন্তান এই রমণী দ্বিপেন্দ্রের প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েকে আপন করে নেন, ধীরে ধীরে ঠাকুরবাড়ি তথা শান্তিনিকেতনের বড়োমা হয়ে ওঠেন। পারিবারিক কাজকর্ম, সমাজ সেবার মাঝে চলতে থাকে সাহিত্যের সাধনা। পিতা ললিতমোহনের কাছ থেকে জ্যোতিষচর্চার পাঠ পান। বলাইবাহুল্য, তৎকালীন সময়ে মহিলাদের জ্যোতিষচর্চার অনুমতি ছিল না। যদিও পরবর্তীকালে তা বেশিদূর এগোয়নি। ঠাকুর পরিবারের বধু হয়ে এসে স্বামীর আগ্রহে ইংরেজি শেখেন এবং পড়ার আগ্রহ বাড়ে কবিগুরুর কাছ থেকে। রক্তে রাজা রামমোহনের ঐতিহ্য ছিল, তার সঙ্গে পান মহর্ষির আশীর্বাদ। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় সুফীসাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি হয়ে ওঠেন ঠাকুরবাড়ির ধর্মালোচনার মুখ্যব্যক্তি। দীর্ঘ সাতবছর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাথে প্রত্যহ একঘণ্টা ধর্মালোচনা করতেন, ধর্ম সম্পর্কে ভাববিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আরো দৃঢ় হয় তার। ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত কৌলিন্য, গোঁড়ামি তিনি মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।

ঠাকুর পরিবারের মহিলা লেখকদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর পর যিনি সবচেয়ে বেশি গল্প লেখেন, তিনি হেমলতা দেবী। অথচ তিনি বিশেষভাবে আলোচিত হননি কোনো সময়ই।

ধর্মছাড়াও কবিতার বইও প্রকাশ করেছিলেন হেমলতা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সুর দেন। হেমলতা দেবীর গানের সুর ও স্বরলিপি করেছিলেন ইন্দিরা দেবী, বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তত্ত্ববোধিনীতে - হেমলতা দেবীর লেখাগুলি বেশিরভাগই কবিতা। ছোটছোট কবিতাগুলির আধ্যাত্মবাদ পূর্ণ, কিন্তু তা সহজেই বোধগম্য। তার কবিতাগুলি বর্তমানের কবিতার তুলনায় অনেকবেশি সহজ সরল, তবে ১৯১০-১৯১২ সালে এই কবিতাগুলি সমাজে খুবই প্রশংসিত ছিল। সব কবিতাই ছন্দবদ্ধ কবিতার আবির্ভাব সেইভাবে হয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর লেখার অনুরাগী ছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বৌদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর পরে হেমলতা দেবীই লেখার মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রথম লীলা পুরস্কারে ভূষিত করে। ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য ছিল সমাজসেবামূলক কাজ করা, হেমলতা দেবী সেই ঐতিহ্যকে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যান। ঘরোয়া ভঙ্গিতে অথচ আধুনিক ভাবাপন্ন প্রবন্ধ লিখে জয় করেছিলেন তখনকার মহিলা সমাজের মন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বেশকিছু প্রবন্ধ লেখেন তিনি, 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর', 'বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ', 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ', 'আশ্চর্য্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন সাধনার ধারা'-- পড়লে পাঠক রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহু অজানা দিক জানতে পারেন। তার জন্য পাঠক সমাজ হেমলতা দেবীর কাছে কৃতজ্ঞ। দ্বিপেন্দ্রনাথের পরিবারে সুশীলা, হেমলতার পরেও বধুরূপে এসেছে চারুশীলা দেবী, সুশোভনী দেবী, সরোজিনী দেবী, চারুবালা দেবী, সুকেশী দেবী, সবিতা দেবী, কিন্তু হেমলতা দেবীর মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী তারা ছিলেন না। এমন প্রতিভাবান রমণীকে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পরিধেয় দীক্ষা আঙটিটি, যোগ্য উত্তরসূরীর স্বীকৃত হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি সরোজ নলিনী-নারী মঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা, বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের পরিচালিকা, 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর লেখা রচনার প্রকৃতি শুধুমাত্র কবিতা ও প্রবন্ধ, মূলতঃ ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধ, তাছাড়াও তিনি নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। 'জ্যোতিঃ' ও 'অকল্পিতা' (কাব্যগ্রন্থ), 'দুনিয়ার দেনা' ও 'দহেলি' (গল্পগ্রন্থ)

তাঁরই সৃষ্টি। 'দুপাতা' গ্রন্থেও তাঁর রচনা। প্রবন্ধগ্রন্থ 'মেয়েদের কথা' তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সংজ্ঞা দেবীর দুইটি জাপানি গল্প 'মৎসুয়ামার 'আয়না', ও 'ইউরিশিমা', 'পুণ্য' পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষের দশম ও একাদশ সংখ্যায় দেখা যায়।

হেমলতা দেবীর রচনার সময়কাল --

সময়কাল	রচনার সংখ্যা
১৮২৮ শক	১টি
১৮৩০ শক	১টি
১৮৩১ শক	২টি
১৮৩২ শক	৭টি
১৮৩৩ শক	১২টি
১৮৩৪ শক	৭টি
১৮৩৫ শক	৩টি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মোট ৩৩টি লেখা প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালেই বেশিরভাগ (মোট ২০টি রচনা) প্রকাশিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে প্রকাশিত মহিলা লেখকদের রচনার বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিভাগীকরণ ও সংখ্যা)

লেখক	রচনার প্রকৃতি	সংখ্যা
হেমলতা দেবী	কবিতা, প্রবন্ধ	২০
প্রিয়ম্বদা দেবী	কবিতা, প্রবন্ধ	৩৮
নির্ঝরিনী ঘোষ	কবিতা	১
সুরমাসুন্দরী দেবী	কবিতা	১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় হেমলতা দেবীর রচিত প্রবন্ধ/কবিতা :

প্রবন্ধ/কবিতা/রচনা	কল্প, ভাগ, পৃষ্ঠা/সন	সংখ্যা
বালকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত	ষোড়শ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ১৮৩ পৃঃ/১৮২৮ শক, [১৯০৬ খ্রি.]	ফাল্গুন, ৭৬৩
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব	সপ্তদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮১ পৃঃ /১৮৩০ শক, [১৯০৮ খ্রি.]	ফাল্গুন, ৭৮৭
এক	সপ্তদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, ১৭৭ পৃঃ ১৮৩১ শক, [১৯০৯ খ্রি.]	ফাল্গুন, ৭৯৯
রসো বৈ সঃ	সপ্তদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, ১৯৩ পৃঃ ১৮৩১ শক, [১৯০৯ খ্রি.]	চৈত্র, ৮০০
সত্যং	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ১৯ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	বৈশাখ, ৮০১
চৈতন্য	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ৩৪ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	জ্যৈষ্ঠ, ৮০২
তোমার পথে	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ৪৭ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	আষাঢ়, ৮০৩
প্রকাশরূপ	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ৬১ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	শ্রাবণ, ৮০৪
জগত জননী	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ৮৫ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	ভাদ্র, ৮০৫
বিশ্বযোগ	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ১১৭ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	কার্ত্তিক, ৮০৭
অন্তরে বাহির	সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ১৪৮ পৃঃ ১৮৩২ শক, [১৯১০ খ্রি.]	পৌষ, ৮০৯
স্বপ্নভঙ্গ	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ৩১ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	জ্যৈষ্ঠ, ৮১৪

কল্পনা ও কল্পনাতীত	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ৮৮ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	শ্রাবণ, ৮১৬
পূজা	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ,১৩৫ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	আশ্বিন, ৮১৮ কার্ত্তিক ৮১৯
সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ১৫২ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	আশ্বিন ৮১৮, কার্ত্তিক ৮১৯
প্রজ্ঞা	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ১৫৫ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	আশ্বিন ৮১৮, কার্ত্তিক ৮১৯
পরিণাম	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ১৬৯ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	অগ্রহায়ণ, ৮২০
চিরসুখ	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ১৮৫ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	অগ্রহায়ণ, ৮২০
অহং ও স্বয়ং	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ২০৯ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	পৌষ, ৮২১
ভারতসন্তান	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ২১৩ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	পৌষ, ৮২১
সুফী আশ্রম	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ২৩৮ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	মাঘ, ৮২২
সুফীগুরু ও সুফী শিষ্য	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ২৭৫ পৃঃ ১৮৩৩ শক, [১৯১১ খ্রি.]	চৈত্র, ৮২৪
সুফীদের ভ্রমণ	অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ১৫ পৃঃ ১৮৩৪ শক, [১৯১২ খ্রি.]	বৈশাখ, ৮২৫
দীপাঞ্জলি	অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ৯৭ পৃঃ ১৮৩৪ শক, [১৯১২ খ্রি.]	শ্রাবণ, ৮২৮
নিরানন্দ	`অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ১৪৬ পৃঃ ১৮৩৪ শক, [১৯১২ খ্রি.]	আশ্বিন, ৮৩০
জানাকথা	অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৩ পৃঃ ১৮৩৪ শক, [১৯১২ খ্রি.]	কার্ত্তিক, ৮৩১
খিলবৎ	অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৬ পৃঃ ১৮৩৪ শক, [১৯১২ খ্রি.]	অগ্রহায়ণ, ৮৩২
অভিজ্ঞতা	অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ২২৬ পৃঃ ১৮৩৪ শক, [১৯১২ খ্রি.]	পৌষ, ৮৩৩
কর্ম্মসাধনা (কবিতা)	অষ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, ২১ পৃঃ ১৮৩৫ শক, [১৯১৩ খ্রি.]	বৈশাখ, ৮৩৭
সাধনার ধন	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ১৮৩৩ শক,[১৯১১ খ্রি.]	মাঘ, ৮২২
যোগীবেশ	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ১৮৩৫ শক, [১৯১৩ খ্রি.]	জ্যৈষ্ঠ, ৮৩৮
বিশ্বকর্ম্মা	অষ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃঃ ১৮৩৫ শক, [১৯১৩ খ্রি.]	জ্যৈষ্ঠ, ৮৩৮
পরিণতি	অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ,	আষাঢ়, ৮২৭

হেমলতা দেবীর রচনা : বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

হেমলতা দেবী, 'এক' (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা –

এই কবিতায় সূক্ষ্মমর্মদর্শী চিন্তার প্রকাশ পেয়েছে। একের মধ্যে সম্যকভাবের অস্তিত্বকে কবি চিহ্নিত করেছেন। 'যোগের উদয়' দ্বারা বিচিত্র রচনাগুলি এককরূপ নেয়, সেই সত্ত্বাই হল এককসত্ত্বা, 'এক'। একই সুত্রে বাধা হলে মর্মের আনন্দও বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ 'একক' সত্ত্বা মানে একাকিত্ব, নিঃস্বঙ্গ নয়, এখানে 'এক' মানে সামগ্র সত্ত্বা।[১]

হেমলতা দেবী, 'অহং ও স্বয়ং' (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা –

এই অসাধারণ কবিতাটির মধ্যে লেখক অহং অর্থাৎ অহংকারে ব্যাখ্যা করেছেন, মানুষের অহংবোধ তার নিত্য অনুচর বলে ব্যক্ত করেছেন। হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনা, প্রায় সমস্ত অনুভূতিতেই যেন অহংবোধ জড়িয়ে থাকে। তপস্বী হওয়ার সাদ কারো নেই, সকলেই খ্যাতি, মান, জনপ্রিয়তা বর্জনের প্রতি আসক্ত। এই বোধটিকে কাটিয়ে উঠা খুবই কঠিন, নাগপাশের মতো এটি মানুষকে চতুর্দিক থেকে বেঁধে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে অহংকে জয় করার জন্য স্বয়ং ভাবকে

উজ্জীবিত করতে হবে।অহংবোধের ফলে যেমন সারাসার বোধ চলে যায়, স্বয়ংবোধ দ্বারা মানুষ জীবনের প্রকৃত সত্যকে জানতে পারে।[২]

হেমলতা দেবী, 'সাধনার ধন', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা –

এই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কবিতাটিতে লেখকের আধ্যাত্মিক চেতনা, পরমেশ্বরের প্রতি নিবিড় ভক্তি সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটির সারমর্ম এই যে, যে পরমপূজ্য সত্ত্বা মানুষের দ্বারা প্রদেয় সকল আঘাত বিড়ম্বনা প্রতিনিয়ত সহ্য করে, সেই মানুষের প্রতি তাঁর করুণা বর্ষণ করে চলেছেন, সেই ঈশ্বরকে পাওয়াই জীবনের পাথেয়। অতিক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রের মধ্যে, আবার বিশালবৃহৎ সত্ত্বা থেকেও অধিক বড় সত্ত্বার ভিতর যে শক্তির অস্তিত্ব বতর্মান, তাই পরমেশ্বর সত্ত্বা।[৩]

হেমলতা দেবী, 'চিরসুখ' (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা –

এই অন্যন্য সাধারণ কবিতাটি মূলতঃ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মর্মকথোপকথনকে ব্যাখ্যা করেছে। অতি সুখে মানুষ ঈশ্বরকে সাধনা করেন, নিজ সুখের মোহাচ্ছন্নভাবের ফলে আত্মবিস্মৃত হয়, আপন অন্তর আত্মাকে অস্বীকার করে। কিন্তু নিবিড় বেদনাকালে তার পরমেশ্বরকে স্মরণে আসে। লেখকের ভাষায়, সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি আঙ্কাক্ষিত, তাহলে আপনসত্ত্বা সহজেই সকল ভুলে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে, ও দুঃখ মীমাংসা এবং আঙ্কাক্ষিত আনন্দের পথে যেতে পারে। বোধকরি, সেইকারণেই ঈশ্বর মানুষকে চিরসুখী করেন না, দুঃখের সাথে যাতে সে ঈশ্বরকে চিনতে পারে।[৪]

হেমলতা দেবী, 'পরিনাম', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা –

জন্ম ও মৃত্যু প্রসঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর এক কবিতা রচনা করেছেন লেখক। জীবন ও মৃত্যু যে পরস্পরের সাথে একই সুত্রে গাঁথা, একে অপরে মিলেমিশে একসত্ত্বায় পরিণত, তা এই ক্ষুদ্র পরিসর রচনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে বর্ণিত। মৃত্যু যেন জীবনের সংজ্ঞাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। আবার, জীবনের পরিণতি মৃত্যুতেই পরিপূর্ণ হয়, এটি এক অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক চেতনা, যার পরিচয় পাঠক পেয়েছে এই রচনার মধ্যে দিয়ে।[৫]

হেমলতা দেবী, 'পূজা' (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এই কবিতাটি ঈশ্বরের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন দর্শায়। হৃদয়ের সকল কালিমা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করলে, সে মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। পরমেশ্বরের পথে শুধুই আলোর দিশা দেখতে পাওয়া যায়। এই কবিতায় লেখকের মধ্যে প্রকাশিত গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনাকে পরিলক্ষিত হয়েছে।[৬]

হেমলতা দেবী, 'কল্পনা ও কল্পনাতীত' (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে এক অদ্ভুত ছন্দময় রচনার সৃষ্টি করেছেন হেমলতা দেবী। কল্পনার রাজ্যে মননের নিত্য যাতায়াত, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা কার্যত অসম্ভব। কল্পনা মানুষের মনের আনন্দদায়ক হলেও বাস্তব জীবনকে জ্যোতিময় করে তোলে। কল্পনা ও বাস্তবের দ্বৈত সহবাস অদ্ভুত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে, এই রচনার মাধ্যমে।[৭]

হেমলতা দেবী, 'ভারতসন্তান', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

লেখক এখানে কল্পনাশ্রয়ী কোনো যুগ পুরুষের চরিত্রকে বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে এমন কোনো যুবশক্তিকে লেখক আহ্বান করেছেন, যা সত্যিই কালজয়ী। এমন কোন সত্ত্বা যে অন্ধকারে আলোর সন্ধান দেয়, চিত্তের অপূর্ণ চিত্রকে পূর্ণতা দেয়, বাধাহীন ভাবে চিত্তকে মুক্তির দিশা দেখায়, সুখ-দুখে অবিচল থেকে ভয়কে জয় করে, শ্রেয়ের সাধনা, শ্রেয় আরাধনা নিজেকে আহুতি দেয়। লেখক তাঁর লেখার মাধ্যে দিয়ে তৎকালীন নববঙ্গ সমাজকে

উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, তিনি এমন যুবসমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে সমাজ ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম, তাদের কাজে জগৎবাসী ধন্য ধন্য করবে।[৮]

হেমলতা দেবী, 'প্রজ্ঞা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এই রচনায় লেখক প্রজ্ঞার সঠিক সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের ভক্তদের অন্তঃকরণে মহাপুরুষদের দিব্যবাণীর আলোরই প্রজ্ঞার প্রকৃত অর্থ। প্রজ্ঞা মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচায়ক। এটি অবশ্যই ইন্দ্রিয়বোধ ও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি থেকে ভিন্ন ভাব। বুদ্ধি হল স্বাভাবিক সত্ত্বা, যা ভালো-মন্দের প্রভেদকে সঠিক অর্থে বুঝতে সাহায্য করে। তবে প্রজ্ঞা মূলতঃ দু'ইভাবে বিভক্ত, একভাব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, অন্যটি যুক্ত ঈশ্বরসৃষ্ট জীবদের সাথে। যারা জীবনে চলার পথে ঈশ্বরের নির্দিষ্ট করা পথে অর্থাৎ সৎনিষ্ট, পবিত্র কর্মের অধীন, তারা প্রকৃত প্রজ্ঞার বশবর্তী। প্রজ্ঞার তিনটি ভাব, প্রথমটি ইল্ ম্-ই-তৌহিদ অর্থাৎ ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, দ্বিতীয়টি, ইল্ ম্-ই-মরিফৎ অর্থাৎ ঈশ্বরের কার্যের সম্বন্ধে জ্ঞান, শেষটি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। এই তিন পথের ধারা স্বতন্ত্র, ঈশ্বরের পথ অনুসন্ধানকারী মানুষ যুক্তি ও প্রত্যয়ের সাথে ঈশ্বরের ঐক্যে, পরলোকে, ঈশ্বরের কার্য্যে বিশ্বাস করে। তার মতে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরবিৎ পুরুষের অবস্থিতি ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের নিদর্শন। ঈশ্বরের অনুপস্থিতির ভগবদ কৃপার অভাবও ভ্রান্তি, অজ্ঞানতাই অন্ধকারের শিকড়।[৯]

হেমলতা দেবী, 'স্বপ্নভঙ্গ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এখানেও কবি ঈশ্বর সাধনার আধ্যাত্মিক ভাবের কথা বলেছেন। মোহ অন্ধকার কেটে চেতনার ভাব প্রকাশিত হওয়ার মতো সত্যকে সুচারুভাবে বর্ণিত হয়েছে। আপন আপন অপরূপ চেতনা কখনো কখনো সত্যের আলোর সন্ধান পেয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে, আবার, কখনো কখনো আঁধারে হারিয়ে যায়। ঈশ্বরের সাধনাই একমাত্র পথ যা মনকে সৎ ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে, কবি এই কবিতার মাধ্যমে সেইপথেরই সন্ধান দিয়েছেন।[১০]

হেমলতা দেবী, 'কর্ম-সাধনা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এই কবিতা লেখক কর্ম সাধনার কথা বলেছেন। অকারণে অলসকায়ে জীবনযাপন না করে কর্মের মাধ্যমে জীবনকে সাধনার স্তরে উপনীত করার কথাই বলেছেন, যার জন্য প্রয়োজন কর্মের প্রতি মনসংযোগ, একাগ্রতা। মনের ভাবনাকে কাজের গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে হবে, কর্মের মধ্যে দিয়েই সুখের খোঁজ করতে হবে। সহস্র বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করেও কর্মস্থির, কর্মবীর করে তোলার প্রার্থনায় রত লেখক। অসাধারণ এই কবিতাটি পাঠকদের জীবনের দিকদর্শনে সহায়তা করেছে, ভবিষ্যতেও করবে, তাই আশা।[১১]

হেমলতা দেবী, 'বিশ্বকর্ম্মা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

ঈশ্বরকে এখানে বিশ্বকর্মা, তপস্বী, মহা যশস্বারূপে জ্ঞান করা হয়েছে। বিশ্বকর্মা তার কর্মসাধন করে মানবের কার্যের মধ্যে দিয়ে। তার ধ্যানের গর্ভে বিশ্বখানি নিহিত, আবার ধ্যানযোগেই বিপুলকর্মভার সহজেই লঘুভার হয়ে যায়। লেখক এই বিশাল শক্তিকে আত্মজ করে নিজ কর্ম সাধনের চেষ্টা করতে চেয়েছেন, এটি তাঁর বঞ্চনা, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন।[১২]

হেমলতা দেবী, 'যোগীবেশ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

সুখ-দুঃখকে পার করে পরম সত্যের সন্ধান করার বন্দনাই এই রচনার মূল বিষয়বস্তু। সুখকে জয় করা সহজ নয়, মানুষ সহজেই সুখের কঙ্গাল হয়ে মিথ্যার পথে ধাবিত হয়ে থাকে। তাতে সে ঈশ্বরকেও হারিয়ে ফেলে। এই কবিতায়

কবির আকুল প্রার্থনা যে সে এই দুঃখ, সুখের মোহ কাটিয়ে, সহস্রধারা বিপত্তি, প্রলোভন সত্ত্বেও যোগীবর অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবনায় মিশে যেতে পারে না।[১৩]

হেমলতা দেবী, 'সুফী-ধর্মমত ও সাধনা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় (৮১৮ এবং ৮১৯ সংখ্যায়) হেমলতা দেবীর আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যা ছিল সুফী-ধর্মমত ও সাধনার উপর। সুফী সাধকেরা অনেকেই মনে করেন যে, সুফীবাদের বীজ আদমের সময় থেকেই রোপিত যা সম্পূর্ণ মদিরায় পরিণত হয় মহম্মদের সময়। আবার জনৈক এক মহিলা সুফীবাদীর কথাও ইবন খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন, যার নাম রাবিয়া। সম্পাদকের কথায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফী ধর্মগুরু মহম্মদ-ই-সরবর্দ্দির রচিত 'Abadi-kul-Mharic' গ্রন্থে সুফীধর্মের সমস্ত বিধিনিয়ম সাধনা পদ্ধতি লেখা রয়েছে। আবার, আধুনিক ভাবার্দশবাদী সুফীরা কোরাণে বিশ্বাস করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে পরমাত্মা থেকে জীবাত্মারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মারা মধ্যে অনাদি অনন্তকালের দিনে যে অঙ্গীকার বাণী ঘোষিত হয়েছে, সেই অঙ্গীকারেও তারা বিশ্বাসী। সুফী ধর্মামতানুসারী চারটি অবস্থা পেরোলে পর মানুষ শারীরিক আবরণ থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রথমাবস্থা হল সরিয়ৎ অর্থাৎ এই অবস্থায় শিষ্যরা ইসলামধর্মের অনুষ্ঠানগুলি পালন করে। দ্বিতীয় স্তর হল তরিকৎ, এই অবস্থায় মুরিদ শক্তিলাভ করে, সুফীমতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সাধনার বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে নিজেকে মুক্ত করা, শেখ তখন শিষ্যদের পীরেদের কাছে প্রেরণ করে, তখন সেই তার শিক্ষাগুরু। তারপরের স্তরটি হল (তৃতীয়স্তর) মরীফৎ, এখানে মুরিদ বা শিষ্যরা অপার্থিব জ্ঞান লাভ করেন এবং দেবদূতগণের সমান বিবেচিত হন। শেষ পর্যায়টি হল হকীকৎ অর্থাৎ এই পর্যায় মুরিদরা সত্যের সাথে অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হন।

সুফীবাদের মূল দু'টি ধারা দেখা যায়, একটি হালুলিয়া অর্থাৎ দেবানুপ্রাণিত, তাঁরা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, অন্যটি ইত্তিহাদিয়া অর্থাৎ অভেদ-মিলনবাদী, এই শাখা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর জ্ঞানীমাত্রের সহিত যুক্ত। সুফীদের মধ্যে কবিদের স্থান সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। জেলালুদ্দিন রুমীর কথা প্রথমেই স্মরণীয়। রয়েছেন নূরুদ্দীন আব্দুর রহম্ নী জামী ও তাঁর রচনা। গুলিস্থান, বুস্তানা সাদি ও দেওয়ানা হাফেজের রচনা সুফীবাদের ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচিত। সাহল ইব্ ন আবদুল্লা শুস্তরিও রয়েছেন খ্যাতনামা সুফী সাধকদের তালিকায়। তবে সুফীরা মনে করেন প্রকৃত গুরু খুজেঁ পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবার, সুফীবাদে স্বর্গ, নরক, পাপ-পূণ্য ধর্মশাস্ত্রের বাহ্যিক রূপক হিসাবে বিবেচিত, তারা গূঢ় ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী। তাদের কাছে সত্য ও মিথ্যা বা অসত্যই মূল বিচার্য। অর্থাৎ আত্মাভিমান ঘুচিয়ে অসৎকে বর্জন করে, সত্য স্বরূপের সাথে মিলন মানুষের আসল সাধনা। বলাই বাহুল্য, এই প্রবন্ধে সুফীবাদের ভিন্নভিন্ন দিক, যেমন – সাধনার চারটি অবস্থা, সুফী মতবাদের শাখা, সুফী সাধক কবিদের নাম এবং সুফীদের মূল আদর্শ ইত্যাদি দিক সংক্ষিপ্তভাবে সুচারুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৪]

হেমলতা দেবী, 'সুফী-গুরু ও সুফী-শিষ্য', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

হেমলতা দেবীর আরও একটি প্রবন্ধ, যা সুফীবাদের উপর রচিত, প্রকাশিত হয়েছিল অষ্টাদশ কল্পের প্রথম ভাগের ৮২৪ সংখ্যায়, ১৮৩৩ শকাব্দে। পারস্য সুফীশাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ থেকে নেওয়া তাঁর এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, সুফী-গুরু ও সুফী-শিষ্য। গুরু হল ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদের প্রতিনিধি। তিনি প্রতিনিধিত্ব দ্বারা ঈশ্বরের নাম সাধকশিষ্যদের কাছে প্রচার করেন এবং শিষ্যদের-চিত্তে অম্লান আনন্দ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, মানবজাতির প্রতি প্রেম শেখান।[১৫]

হেমলতা দেবী, 'খিলবৎ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৮৩৪ সংখ্যায়), হেমলতা দেবীর আরেকটি সুফীবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মূলতঃ 'খিল্ বৎ' বা নির্জ্জন সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে সংসারজীবন ত্যাগের বাসনাকে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভই জীবনের মূল লক্ষ্য। বিকৃতির দিকে মনের প্রবণতা মাত্রই প্রকৃত বিকার। পদ মর্যাদা প্রাপ্তি, কপটাচারণ,

অলৌকিক কাজ সাধন, কোরাণের শ্লোকব্যাখ্যা করার ক্ষমতা-জ্ঞান প্রভৃতি ইচ্ছাকে বর্জন করে শুদ্ধ কিছু পূজা অভ্যাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্নিধানে চেষ্টাই নির্জ্জন সাধনার্থীর অন্যতম কর্মসাধনা। [১৬]

হেমলতা দেবী, 'সুফীদের ভ্রমণ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অষ্টাদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগে (৮২৪ সংখ্যা, ১৮৩৪ শক) বৈশাখ সংখ্যায় হেমলতা দেবীর লেখা 'সুফীদের ভ্রমণ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এখানে উদ্দাম প্রবৃত্তি দমন ও হৃদয়ের কোমলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, ভ্রমণকাজের বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এই জন্যই আচারবিধির প্রর্বত্তক মহম্মদ ভ্রমণের আদেশ দিয়েছেন এই মতবাদ। প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে অধিকাংশ শেখরাই ভ্রমণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। কেউ সাধনার শুরুতে আবার কেউ সাধনার শেষে জনস্বার্থ কল্যাণকর কাজ করার পূর্বে। উল্লেখ্য, শেখ ইব্রাহিম খ্বাসস্ চল্লিশ দিনের বেশি কোনো একস্থানে বাস করতেন না, তাঁর সাধনার স্বার্থে। এই ক্ষেত্রে এই ধর্মার্দশের সাথে ঈশার মতাদর্শের মিল রয়েছে। তিনিও কোনো একটি নির্দিষ্টস্থানে বেশিদিন বসবাস করেননি।[১৭]

হেমলতা দেবী, 'জানাকথা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

আদ্যিকালের পুরাণপুথির মতো আসলতত্ত্ব কথা লুকায়িত রয়েছে, যে বিশ্বকে জয় করতে হলে প্রথমে নিজনিজ সত্ত্বাকে জানতে হবে। সকলেই নিজনিজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সকলেই নিজেকে সমাজে প্রতিষ্টিত করার আয়োজন র, কিন্তু অপরকে চেনানোর আগে নিজেকে নিজে চেনা প্রয়োজন। মানুষ সভার মাঝে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজ মহিমা জাহির করার' চেষ্টা করে সর্বদাই। নিজে নিজেকে কিভাবে চিনবে তা অজানা। শুধুই নেওয়ার কথা ভাবি, দেওয়ার কথা ভাবি না, তাই বহু ধর্মকথা, নীতিকথা শুনেও তা মানার প্রয়োজন মনে করা হয় না। একারণে জগতও দেওয়ার নামে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ হৃদয়ের ভক্তি, প্রার্থনা, প্রেম শ্রদ্ধার সাথে বিশ্বসংসারের ভাবভক্তি না মিশে গেলে, তা সম্পূর্ণতা লাভ করে না।[১৮]

হেমলতা দেবী, 'দীপাঞ্জলি', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এইটি ভিন্ন রকমের ঈশ্বর সাধনা এবং আত্মনির্দেশক রচনা। জীবনের সাথে যেখানে ঈশ্বর সাধনা মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছে, সেইখানের জীবনের সত্যলাভ হয়েছে, সেইস্থানেই জ্বলে উঠেছে জীবনের সার্থকতা, প্রকৃত প্রাপ্তি। জীবনের যে দীপশিখা জ্বলে উঠে, তা ঈশ্বরের সত্ত্বার সাথে মিলেমিশে একাকার, কোনো ভিন্ন অস্বস্তিই সেখানে পাওয়া যায় না। আর যেস্থানে অন্তরাত্মা এবং ঈশ্বর একসাথে মিলেমিশে একাকার, সেইস্থানেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা।[১৯]

হেমলতা দেবী, 'নিরানন্দ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

কবি এখানে নিরানন্দ নয় তার কথা বলেছেন। মানুষ কোনো কোনো সময় নিজকে সুখী-আনন্দময় দেখার চেষ্টা করলেও প্রকৃত অর্থে নিরানন্দের জীবনযাপন করে। মোহে, লোভের ঘোরে পড়ে, সত্যকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরকে অমান্য করে, অনিত্যগামী জীবনযাপন করে চলে। ফলে 'আত্মঘাতের কুহকে' পড়ে শুধুমাত্র আনন্দের স্বপ্ন দেখাই চলে, প্রকৃতপক্ষে আনন্দ অধরাই থেকে যায়।[২০]

হেমলতা দেবী, 'পরিণতি', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

মনুষ্যজীবন ফুলের মতো ফোঁটাই নয়, ফলের মতো সরসরসে সিক্ত করার মধ্যে দিয়ে সম্পৃক্ত করে তোলাও বটে। অর্থাৎ, একদিকে যেমন চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে চারিপাশের ব্যক্তি, বস্তুতে জীবনের সুগন্ধ ছড়াতে পারে। অন্যদিকে জীবনরসে তৃপ্ত করে তাঁর দান ভাণ্ডারকে, অর্থাৎ, জীবনে নিজে যেমন সমৃদ্ধ হতে হবে, তেমনি চারাপাশের জীবনকেও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, উভয়ই মানবজীবনের কর্তব্য।[২১]

হেমলতা দেবী, 'সুফী আশ্রম', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

'সুফী আশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠক সুফী সম্প্রদায়ের বহুবিধ অজানা তথ্য জানতে পারবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আশ্রমের লোকেরা দু'প্রকারের হয়, এক শ্রেণী পরিব্রাজক অন্যশ্রেণী আশ্রমবাসী। ভ্রমণকালে কোনোখানকার অপরাহ্নে কোনো মস্ জিদে অথবা নিভৃত স্থানে বা আশ্রমে আশ্রয় নিতে পারে। আশ্রম সেবকেরা তাদের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রফুল্লমুখে কিছু আহার্য্য নিবেদন করে, আশ্রমে থাকার জন্য আহ্বান করেন।

আগন্তুকেরা আশ্রমবাসীদের জন্য কিছু আহার্য্য বা উপহার নিয়ে আসবেন, এটাই বিধি। বাক্যালাপে কোনো অহংমিকা প্রদর্শন করতেন না, শান্ত ভাবে শেখদের সাথে আলাপ করবেন। খানকা থেকে বাহিরে যাবার ইচ্ছা থাকলে আশ্রমবাসীদের জানাতে হবে। তিন দিনের বেশি দিন থাকার ইচ্ছে থাকলে, তাদের আশ্রমের কোনো একটি কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ ঈশ্বর সাধনায় মন দেয়, তাহলে তাকে আর সেবার কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে না।[২২]

হেমলতা দেবী, 'রসো বৈ সঃ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

'এ জগত রসেতে মদন' এই রস ভক্তিরস, সাধনায় যা প্রাপ্ত। যে সত্ত্বা এইরসের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি জীবনে প্রজ্ঞা লাভ করেছেন। তার জীবন সার্থক। ভক্তিরসে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জীবনে হার জিত দাগ কাটে না, তিনি চৈতন্য লাভ করেন। বলাইবাহুল্য, হেমলতা দেবীর রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভক্তি সাধনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[২৩]

হেমলতা দেবী, 'সত্যং', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

বিশ্বজগত শুধুমাত্র 'সত্য' দ্বারা পরিচালিত, প্রতিষ্টান, একথাই কবি এই কবিতার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন। সত্য বিচলিত হলে, সমস্ত বিশ্ব চরাচর, কর্মযজ্ঞ, জীবনের অস্তিত্ব – প্রাণের মহিমা মিথ্যাজ্ঞান হয়। বিশ্বজগতের সমস্ত আনন্দ, প্রাণের উজ্জ্বল প্রভাতেই বর্তমান সত্যসত্ত্বা। অসাধারণ এই কবিতাটি যেমন অন্তদর্শনমূখী, তেমনি শ্রুতিমধুর।[২৪]

হেমলতা দেবী, 'চৈতন্য', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

মানবমননে চেতনাকে ব্যক্ত করেন কবি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে। চেতনার রূপ খুঁজে পাওয়াই দুস্কর বিষয়। এই অপরূপ জীবন বোধকে সংজ্ঞায়ত করা সহজসাধ্য নয়। কোনটি চেতনা স্বরূপ বোঝাও অতি দুর্বোধ্য। কবি তাই বারংবার একটি কথাই বলেছেন, 'কে জানে সে চেতনা কিরূপ!' এই চেতনার উন্মেষ বড়ই সাধনার সফল, চৈতন্য সাগরে ডুব দিয়ে এইরূপ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক রচনা এটি তাতে সন্দেহ নেই।[২৫]

হেমলতা দেবী, 'অভিজ্ঞতা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

লেখক এই কবিতায় স্বয়ং পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার সত্যকে উৎঘাটন করতে চেয়েছেন। নিজেকে চিনতে চেয়েছেন। সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতিগুলির কারণ বিশ্লেষণ করে নিজ মননকে জানতে চেয়েছেন। কেউ আপন আবার কেউ পর, তার কারণ কি, তার জানার চেষ্টা চালিয়েছেন অন্তররূপে। ভাল, মন্দ, শুচি-অশুচি এইসবের সংজ্ঞা খুজতে চেয়েছেন। আপন বিচার বুদ্ধির সামনেই নিজেদের দণ্ডমান করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বড়ই দুরুহ কাজ, যা কবি চেতনার বারবার উৎঘাটিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন– 'যত কিছু ফাঁকি ছিল ঢাকাঢাকি...' অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের যত ক্লেশ, দ্বন্দ্ব ও বাধা আছে তা দূরে সরিয়ে জীবনাদর্শে এগিয়ে চলাই, সকলের মূলধর্ম।[২৬]

হেমলতা দেবী, 'তোমার পথে', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এই দীর্ঘাঙ্গী – কবিতাটিতে কবি জীবনের সারকথা বলেছেন। জীবন ভীষণভাবে সমস্ত কাজের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, ফলে জীবনের প্রকৃত সার কোনকোন সময় অধরাই থেকে যায়। এখানে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়েছে

স্বয়ং ঈশ্বর তথা অন্তরযামীকে, অন্যদিক থেকে বলতে গেলে, আপন অন্তসত্ত্বাকে উল্লেখ করা হয়েছে। তার অস্তিত্ব জানা গেলে, জীবনের পথ অনেক সহজ, সরল, আনন্দময় হয়ে যায়। কর্মবিস্তৃত জীবন অনেক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও ঈশ্বর দর্শনে একাগ্রতা ফিরে পাওয়ার মতো সহজ কথাই, এখানে চর্চিত হয়েছে।[২৭]

হেমলতা দেবী, 'প্রকাশরূপ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

কবিতায় কবি নিরাকার ঈশ্বরের প্রকাশ রূপের বর্ণনা করেছেন। যে শক্তি বিশ্বমূলে বিদ্যমান, যে শক্তি জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে বর্তমান, পুষ্পমুকুলে যে শক্তির দ্বারা সৌরভ সুভাষিত হয়, বেশকিছু মানবমননে অমৃত-চেতনার সৃষ্টি করা, তাই নিরাকার ব্রহ্ম, স্বয়ং ঈশ্বর সম। যেই প্রকাশশক্তি আদিঅন্তহীন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার মাঝে বিহীন, তাই একেশ্বর ব্রহ্মজ্ঞানরূপ। এখানে উল্লেখ্য, কবি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হওয়ায় নিরাকার একেশ্বরবাদের ধারণা তার লেখায় প্রতিভাত হয়েছে বারংবার।[২৮]

হেমলতা দেবী, 'জগতজননী', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

কবিতাটি মূলত স্বদেশ প্রীতি, মাতৃভূমির প্রতি কবির ভাবনার প্রতিবিম্ব। ভারতমাতা তিনি তার সন্তানদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের সন্তানসম যত্নে-স্নেহে পালন করে চলেছেন যুগযুগ ধরে। তার এই উদারতা, এই সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ অব্যক্ত। শত শত বছর ধরে মাতৃভূমির কাছে কৃতজ্ঞ, তাদের ধারণ করার জন্য। কবির লেখায় জাতীয়তাবাদের আভাস পাওয়া যায়।[২৯]

হেমলতা দেবী, 'বিশ্বযোগ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কবি বিশ্ব সংসারের একরূপকে ব্যক্ত করেছেন, ভিন্নভিন্ন ভাব-সাধনা সবের শেষ এক মতাদর্শের প্রকাশ। সবে একে 'মিললেই বিশ্বের পরমরূপ হবে দরশন'। প্রকৃতপক্ষে, একেশ্বরবাদের প্রচ্ছন্নভাব না কবির লেখনীতে দর্শায়। এই একরূপ ধর্মীয় হতে হবে, জাতিগত হতে হবে। এই এক্যভাব উপলব্ধ হলেই কবির ভাষায় 'সার্থক হইবে জন্ম সকল জীবন'।[৩০]

হেমলতা দেবী, 'অন্তরে বাহির', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এই কবিতাটিতে কবি বাহ্যিক জগতের কর্মযজ্ঞ এবং তার সাথে অন্তরমননের ভাবের সমন্বয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমন্বয় সৃষ্টি করা অতি দুরুহ বিষয়। অন্তরের লীন ঈশ্বরের চেতনাকে বাহ্যিক কার্যের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার সংকল্পই নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা। এখানে উল্লেখ্য, কবির বেশিরভাগ কবিতার মূল সেই ঈশ্বর সাধনা, অন্তরে মনন উন্মেষ ও চেতনার অস্তিত্ব।[৩১]

হেমলতা দেবী, 'বালকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এটি একটি রচনা ধর্মীক প্রবন্ধ। মূলতঃ আশ্রমের (শান্তিনিকেতন) বালকগণের উদ্দেশ্যে লেখিকার বার্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলাইবাহুল্য, শান্তিনিকেতনে হেমলতাদেবী আশ্রমিকদের কাছে অতি পরিচিত মানুষ ছিলেন, তারবার্তা প্রকাশিত হওয়াটা বস্তুত প্রাসঙ্গিক।[৩২]

হেমলতা দেবী, 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—

এটি একটি গদ্যলিখিত ব্রহ্মোৎসবের বিবরণী, যা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিবছরের ন্যায় পালিত হত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হওয়ায় হেমলতা দেবীর এই রচনাটি/প্রতিবেদনটি এখানে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৩]

উপসংহার :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্যক রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে, মোট ৩৩টি লেখার সন্ধান পাওয়া যায়, যা হেমলতা দেবীর দ্বারা রচিত। ১৮২৮ শকে ১টি, ১৮৩০ শকে ১টি, ১৮৩১ শকে ২টি, ১৮৩২ শকে ৭টি, ১৮৩৩ শকে ১২টি, ১৮৩৪ শকে ৭টি, ১৮৩৫ শকে ৩টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, ১৮৩৩ শকে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই তাঁর রচনা (কবিতা বা প্রবন্ধ) প্রকাশিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, বেশকিছু বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ ১৮২৮ শক থেকে ১৮৩৫ শক পযর্ন্ত, অর্থাৎ মোট ৮টি শকাব্দে (বছরের) মধ্যেই তাঁর লেখা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে বেশিরভাগ রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনাকালে (মোট ২০টি)। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় সুফীবাদের চর্চা ও পুস্তক রচনা করলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর রচনার প্রকৃতি মূলতঃ কবিতা। মোট ৩৩টি রচনার মধ্যে ৭টি প্রবন্ধ ছাড়া বাকীগুলি কবিতা, অর্থাৎ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিরিখে লেখিকাকে 'কবি' বলাই শ্রেয়। তৃতীয়তঃ তার রচনা, প্রায় প্রতিটির মধ্যেই নিরাকারবাদ, একেশ্বরবাদ, আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে। 'সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা', 'সুফী আশ্রম', 'সুফীগুরু ও সুফী শিষ্য', 'সুফীদের ভ্রমণ', 'খিলবৎ' – প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ রূপেই ধর্মবিষয়ক। তাছাড়া 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব' – রচনাটি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পর্কিত প্রতিবেদন, অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক। চতুর্থতঃ তাঁর রচিত কবিতাগুলি দীর্ঘাঙ্গিক নয়, এবং আত্মমননস্পর্শী। নির্দিষ্ট ছন্দ ও ভাবে আবদ্ধ। প্রায় প্রতিটি কবিতার অন্তরভাবে আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ রয়েছে। বিশেষতঃ 'অন্তর বাহিরে', 'পূজা', 'কল্পনা ও কল্পনাতীত', 'কর্মসাধনা', 'বিশ্বকর্ম্মা', 'প্রজ্ঞা' – ইত্যাদি কবিতায় সুস্পষ্ট ঈশ্বর চেতনা বর্তমান। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ঠাকুর পরিবারের সদস্য ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে, তাঁর লেখায় ধর্মীয়, বিশেষতঃ নিরাকার ব্রহ্মের আধ্যাত্মিকভাব বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতাদেবী সুফীধর্মের উপর বই-এর অনুবাদ করেছিলেন। বলা প্রয়োজন, ব্রহ্মধর্মের মতোই সুফীধর্মও একেশ্বরবাদ ও নিরাকর সত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এবং এই বিষয়ক ৫টি দীর্ঘরচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাঠকগণ দেখতে পায়।

তথ্যসূত্র :

১. দেবী, হেমলতা, এক (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৮৩১ সন, পৃ. ১৭৭
২. দেবী, হেমলতা, অহং ও স্বয়ং (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, পৌষ সংখ্যা, ৮২১ সংখ্যা. ১৮৩৩ সন, পৃ. ২০৯
৩. দেবী, হেমলতা, সাধনার ধন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, মাঘ সংখ্যা (৮২২ সংখ্যা). ১৮৩৩ সন, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ, পৃ. ২৪১
৪. দেবী, হেমলতা, চিরসুখ (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা (৮২০ সংখ্যা). ১৮৩৩ সন, পৃ. ২০৯
৫. দেবী, হেমলতা, পরিনাম, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা (১৮৩৩ সন), রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ, পৃ. ১৬৯
৬. দেবী, হেমলতা, পূজা (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা, ১৮৩৩ সন, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ, পৃ. ১৩৫
৭. দেবী, হেমলতা, কল্পনা ও কল্পনাতীত (কবিতা), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, শ্রাবণ সংখ্যা (৮১৬ সংখ্যা), ১৮৩৩ সন, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ, পৃ. ৮৮
৮. দেবী, হেমলতা, ভারতসন্তান, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, পৌষ সংখ্যা (৮২১ সংখ্যা), ১৮৩৩ শক, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ, পৃ. ২১৩
৯. দেবী, হেমলতা, প্রজ্ঞা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা (৮১৮ ও

৮১৯ সংখ্যা), ১৮৩৩ শক, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ, পৃ. ১৫৫

১০. দেবী, হেমলতা, স্বপ্নভঙ্গ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (৮১৪ সংখ্যা), পৃ. ৩১

১১. দেবী, হেমলতা, কর্ম-সাধনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, বৈশাখ (৮৩৭ সংখ্যা), পৃ. ২১

১২. দেবী, হেমলতা, বিশ্বকর্ম্মা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, জৈষ্ঠ্য সংখ্যা (৮৩৮ সংখ্যা), ১৮৩৫ শক, পৃ. ৩৮

১৩. দেবী, হেমলতা, যোগীবেশ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (৮৩৮ সংখ্যা), ১৮৩৫ শক, পৃ. ৪৪

১৪. দেবী, হেমলতা, সুফী-ধর্মমত ও সাধনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা, ৮১৮ এবং ৮১৯ সংখ্যা

১৫. দেবী, হেমলতা, সুফী-গুরু ও সুফী-শিষ্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথম ভাগ, ৮২৪ সংখ্যা, ১৮৩৩ শকাব্দ

১৬. দেবী, হেমলতা, খিলবৎ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ১৯৬

১৭. দেবী, হেমলতা, সুফীদের ভ্রমণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, (৮২৪ সংখ্যা, ১৮৩৪ শক), বৈশাখ সংখ্যা,

১৮. দেবী, হেমলতা, জানাকথা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, কার্তিক সংখ্যা, ১৮৩৪ শক, পৃ. ১৭৩

১৯. দেবী, হেমলতা, দীপাঞ্জলি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৮৩৪ শক, পৃ. ৯৭

২০. দেবী, হেমলতা, নিরানন্দ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, আশ্বিন সংখ্যা, ১৮৩৪ শক, পৃ. ১৪৬

২১. দেবী, হেমলতা, পরিণতি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, আষাঢ় সংখ্যা (৮২৭ সংখ্যা), পৃ. ৭৬

২২. দেবী, হেমলতা, সুফী আশ্রম, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, প্রথমভাগ, মাঘ সংখ্যা (৮২২ সংখ্যা) ১৮৩৩ শক

২৩. দেবী, হেমলতা, রসো বৈ সঃ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, চৈত্র সংখ্যা, ১৮৩১ সন, পৃ. ১৯৩

২৪. দেবী, হেমলতা, সত্যং, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, বৈশাখ সংখ্যা, (৮০১ সংখ্যা), পৃ. ১৯

২৫. দেবী, হেমলতা, চৈতন্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, (৮০২ সংখ্যা), পৃ. ৩৪

২৬. দেবী, হেমলতা, অভিজ্ঞতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, পৌষ সংখ্যা, ১৮৩৪ শক, পৃ. ২১৬

২৭. দেবী, হেমলতা, তোমার পথে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, আষাঢ় সংখ্যা, (৮০৩ সংখ্যা), ১৮৩২ শক, পৃ. ৪৭

২৮. দেবী, হেমলতা, প্রকাশরূপ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, শ্রাবণ সংখ্যা, (৮০৪ সংখ্যা), ১৮৩২ শক, পৃ. ৬১

২৯. দেবী, হেমলতা, জগতজননী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ভাদ্র সংখ্যা, (৮০৫ সংখ্যা), ১৮৩২ শক, পৃ. ৮৫
৩০. দেবী, হেমলতা, বিশ্বযোগ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, পৃ. ১১৭
৩১. দেবী, হেমলতা, অন্তরে বাহির, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, চতুর্থ ভাগ, পৌষ সংখ্যা
৩২. দেবী, হেমলতা, বালকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ষোড়শ কল্প, চতুর্থ ভাগ, ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ. ১৮৩
৩৩. দেবী, হেমলতা, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সপ্তদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ফাল্গুন সংখ্যা, (৭৮৭ সংখ্যা), ১৮৩০ শক, পৃ. ১৮১

গ্রন্থপঞ্জী :

১. দেব, চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫২
২. প্রত্যুষকুমার রীত সম্পাদিত, ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গল্প, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০২১
৩. রায়, দিতি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কাল থেকে কালান্তরে, কলকাতা, আশাদীপ, ২০১৪